# দেশের প্রাচীনতম খাবার দোকান

আমাদের ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাহারি পদের খাবার। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে বিখ্যাত সব খাবার। এবারের জানা-অজানা আয়োজনে পুরোনো কিছু খাবার দোকান নিয়ে জানানোর চেষ্টা করবো। যেগুলোর কোনোটার বয়স একশো বছর আবার কোনটা পঞ্চাশের কোটায়।

## আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেল - ১৯১১

দীর্ঘ ১০২ বছর যাবত বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বগুড়ার আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেল। ১৯১১ সালে বগুড়ার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মরহুম আকবর আলী 'আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেল' প্রতিষ্ঠা করেন। আকবরিয়া হোটেলের একটা বিশেষত্ব আছে। হোটেল প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রতিদিন রাত ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত গরিব মিসকিনদের বিনামূল্যে খাবার খাওয়ানো হয়। হোটেলটির প্রতিষ্ঠাতা আকবর আলী মৃত্যুর পর ও তার ছেলেরা এ রীতি পালন করে আসছে। এখনও প্রতিদিন রাত ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত বিতরণ করা হয় টাটকা খাবার। শহরের গরিব দুঃখীরা এখানে আসেন একবেলা পেটপুরে ভালো খাবারের আশায়।

আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আলহাজ আকবর আলী মিঞা তৎকালীন ভারতের মুর্শিবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্য অন্বেষণে পরিবারসহ বগুড়া জেলার পাশের পাবনা জেলার পাকশি, বগুড়ার সান্তাহার এবং পরে বগুড়া শহরে আসেন। এরপর আকবর আলী তার ভাইয়ের সাথে মেকানিক্যাল কাজ শুরু করেন। ওই সময় বগুড়া শহরে মুসলমানদের খাবারের কোনো হোটেল ছিল না। হিন্দু সম্প্রদায়ের হোটেলে আবার মুসলমানরা যেত না। এখান থেকেই তিনি হোটেল ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু হোটেল করার প্রয়োজনীয় অর্থ তার কাছে ছিল না। হোটেলের পুঁজির জন্য নিজে মিষ্টি তৈরি করে ফেরি করে বিক্রি শুরু করেন। মিষ্টি বিক্রির কিছু পুঁজি নিয়ে ১৯১১ সালে বগুড়া শহরের চকজাদু রোডের মুখে মাসিক ৮ টাকা ভাড়ায় হোটেল ব্যবসা শুরু করেন তিনি। বগুড়া শহরে তৎকালীন আকবর আলীর ছোট্ট হোটেলই ছিল মুসলমানদের একমাত্র খাবার হোটেল। তাই খুব দ্রুত হোটেলের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়ে। সে সময় মুসলমানদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় সেখানে গ্রাহকদের স্থানসঙ্কুলান হতো না। তাই তিনি শহরের থানা রোডে হোটেলটি স্থানান্তর করেন। যা বর্তমানে আকবরিয়া গ্র্যান্ড হোটেল হিসেবে পরিচিত। প্রায় সকল ধরনের খাবারের স্বাদ পাওয়া সম্ভব এই হোটেলে। তবে তাদের তৈরি মিষ্টির আলাদা সুনাম রয়েছে।

## বোস কেবিন - ১৯২১ সাল

শতবর্ষ অতিক্রম করেছে বোস কেবিন। এই রেস্তোরাঁর বয়স ১০২ বছর! ১৯২১ সালে একটি টংঘরে এই বোস কেবিনের যাত্রা শুরু। নারায়ণগঞ্জ জেলা সদরে ২নং রেলগেট এলাকায় অবস্থিত এই ঐতিহ্যবাহী রেস্তোরাঁ। ব্রিটিশ শাসনামল ও পাকিস্তান শাসনামলে রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় নারায়ণগঞ্জসহ অন্যান্য অঞ্চলের তৎকালীন জাতীয় রাজনীতিবিদগণ এখানে আড্ডা দেওয়ার ফলে স্থানটি পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠে। নৃপেন চন্দ্র বসু নামে এক ভদ্রলোক নারায়ণগঞ্জ শহরের ফলপট্টি এলাকায় একটি টংঘরে রেস্তোরাঁটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সকলের মাঝে ভুলুবাবু নামে পরিচিত। নৃপেন চন্দ্র বসু ছিলেন তৎকালীন বিক্রমপুরের (বর্তমান মুন্সীগঞ্জ জেলা) শ্রীনগর থানার ষোলঘর গ্রামের বাসিন্দা। জীবিকার সন্ধানে বিক্রমপুর থেকে নারায়ণগঞ্জে আসার পর তিনি রেস্তোরাঁ ব্যবসা শুরু করেন। প্রথমদিকে চা ও বিস্কুট নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আস্তে আস্তে সেটি রেস্তোরাঁতে রুপ নেয়। ১৯৮৮ সালে রেস্তোরাঁ চেম্বার রোডে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে রেস্তোরাঁটির নাম 'নিউ বোস কেবিন'। এই রেস্তোরাঁর কড়া লিকারের চায়ের খুব নামডাক। দুপুরে দুই ঘণ্টা বাদে সারা দিনই চা পাওয়া যায়। সকালের নাস্তায় পরোটার সঙ্গে ডাল, হালুয়া ও ছয় পদের ডিম পাওয়া যায়। এছাড়া খাসি ও মুরগির মাংস পাওয়া যায় প্রায় সবসময়ই। পাওয়া যায় মোরগ পোলাও, আলুর চপ, মাংসের কারি, মাটন কাটলেট, চিকেন ফ্রাই ও দই। এখানে দুপুরে ভাত বিক্রি হয় না। বোস কেবিনে অনেক বিখ্যাত মানুষের আনাগোনা ছিল এবং এখনো আছে। ১৯৩১ সালের ৭ নভেম্বর। কলকাতা থেকে জাহাজে চেপে নারায়ণগঞ্জে এলেন ভারতবর্ষের প্রবাদপ্রতীম রাজনীতিবিদ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। জাহাজ থেকে নামতেই তাকে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ, নারায়ণগঞ্জ থানায় নিয়ে বন্দী করে রাখে আট ঘণ্টা। এ সময় বোস কেবিনের প্রতিষ্ঠাতা নৃপেন্দ্র চন্দ বোস থানায় গিয়ে এই নেতাকে চা বানিয়ে খাওয়ালে ভীষণ কদর করেন তিনি। তারপর বোস কেবিন

পরিদর্শন করতে এসে খাবার চেখে দেখেছিলেন তিনি। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এসেছেন এই রেস্তোরাঁতে। এছাড়া রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবদুল হামিদ খান ভাসানী উল্লেখ্যযোগ্য। এছাড়াও এখানে সৈয়দ শামসুল হক, সন্তোষ গুপ্ত, রফিক আজাদ, আসাদ চৌধুরী, মোহাম্মদ রফিক, হেলাল হাফিজের মতো কবি-সাহিত্যিকদের পা পড়েছে। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে বোস কেবিন, শুরু থেকেই এই নিয়মে চলছে। ছুটির দিনগুলোতে এখানে তিল ধারণেও জায়গা থাকে না। বিশেষ দিনগুলোতে কিছু বিশেষ মিষ্টি তৈরি করে থাকে বোস কেবিন।

## বিউটি লাচ্ছি অ্যান্ড ফালুদা - ১৯২২ সাল

১৯২২ সালে মো. আবদুল আজিজ লেবুর শরবত ও লাচ্ছি দিয়ে যাত্রা শুরু করেন বিউটি লাচ্ছি দোকানটির। ২০০১ সালে যুক্ত হয় ফালুদা। আবদুল আজিজ পেশায় ছিলেন একজন রাজমিস্ত্রি। অবসর সময়ে তিনি রাস্তার ফুটপাতে শুরু করেন লাচ্ছি আর লেবুর শরবত বিক্রি। পাকিস্তান আমলে রায়সাহেব বাজার মোড়ে জনসন রোডের এই দোকান ভাড়া নেন তিনি।

আজিজ মারা যাওয়ার পর তার ছেলে আব্দুল গাফফার ব্যবসার হাল ধরেন। ২০০০ সালে গাফফার মারা যাওয়ার পর জাবেদের হাতে আসে দোকানটি। পুরান ঢাকার জনসন রোডে বিখ্যাত বিউটি লাচ্ছি অ্যান্ড ফালুদা দোকানের লাচ্ছি, শরবত ও ফালুদা সুনামের সঙ্গে বিক্রি হয়ে আসছে ঢাকাবাসীর কাছে একশো বছর যাবত। তিন প্রজন্মের বিউটি লাচ্ছির বয়স ১০১ ছুঁইছুঁই। ফালুদা তৈরি করা হয় নুডলস, সাগুদানা, কলা, দুধের মালাই, খোরমা খেজুর, কিশমিশ, আনার, আপেল, চেরি ফল, চিনির সিরা ও মধু দিয়ে। জাকির বললেন, বাজারের নুডলস নয়, নিজেদের তৈরি করা নুডলস ব্যবহার করেন ফালুদা তৈরিতে। ফালুদা আছে দুই রকমের, নরমাল আর স্পেশাল ফালুদা। নিজেদের তৈরি দই দিয়ে তৈরি হয় লাচ্ছি। লেবুর শরবতে ব্যবহৃত হয় নিজেদের তৈরি চিনির সিরাপ। প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। রায়সাহেব বাজার মোড়ের পাশাপাশি পুরান ঢাকার কাজী আলাউদ্দিন রোড ও লক্ষ্মীবাজারে আরও দুটি শাখা রয়েছে দোকানটির।

## মাতৃভান্ডার - ১৯৩০ সাল

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের আলেখার চর। মহাসড়কের এ অংশের দু'পাশে তাকালে চোখে পড়বে বেশ ক'টি মাতৃভান্ডারের দোকান। এসব মিষ্টির দোকানের অধিকাংশই নকল মাতৃভান্ডার। কুমিল্লা নগরীর প্রাণকেন্দ্র কান্দিরপাড় থেকে ২০০ গজ পূর্বদিকে মনোহরপুর। মনোহরপুরের একটি টিনশেড ঘরে তৈরি ও বিক্রি হয় আসল মাতৃভান্ডারের রসমালাই। তার দুই পাশে ভগবতী পেড়া ভান্ডার ও শীতল ভান্ডার। উল্টো দিকে কুমিল্লা মিষ্টি ভান্ডারের অবস্থান। ১৯৩০ সালে কুমিল্লা মাতৃভান্ডার রসমালাই বানিয়ে নাম করে। মুক্তিযোদ্ধা প্রয়াত শংকর সেনগুপ্তের হাত ধরে এটি বিকশিত হয়। বর্তমানে তার ছেলে অনির্বাণ সেনগুপ্ত ব্যবসা পরিচালনা করেন। বিভিন্ন গোয়ালার কাছ থেকে দুধ সংগ্রহ করে ওই দুধ চুলায় একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জ্বাল দেওয়া হয়। অন্তত দুই ঘণ্টা জ্বাল দেওয়ার পর দুধ ঘন হয়ে ছানায় রূপ নেয়। এরপর ছানা কেটে ছোট ছোট দানাদার মিষ্টির মতো বানানো হয়। পরে রসের মধ্যে দিয়ে সেটি রসমালাইতে বানানো হয়।

## হাজী বিরিয়ানি - ১৯৩৯ সাল

বিরিয়ানিপ্রেমী কিন্তু পুরান ঢাকার হাজীর বিরিয়ানি খেয়ে দেখেননি তা হতে পারে না। দুপুর, সন্ধ্যা কিংবা মধ্যরাত; ভিড় লেগেই থাকে দোকানে।

হাজী বিরিয়ানি

১৯৩৯ সালে হাজী মোহাম্মদ হোসেন নামে একজন বাবুর্চি রাস্তার ধারের খাবার বিক্রির দোকান হিসেবে রেস্তোরাঁটি চালু করেছিলেন। তার নাম অনুসারে হাজী বিরিয়ানি নাম রাখা হয় দোকানটির। ১৯৯২ সালে হাজী মোহাম্মদ হোসেন মারা যাওয়ার পর, তার ছেলে হাজী মোহাম্মদ গোলাম হোসেন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হাজী মোহাম্মদ গোলাম পারিবারিক ব্যবসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে ব্যবসাটি তার ছেলে হাজী মোহাম্মদ শাহেদের হাতে তুলে দেন। পারিবারিক ব্যবসাটি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। ছাগলের মাংস আর সরিষার তেল দিয়ে বিরিয়ানি রান্নার জন্য সুনাম অর্জন করে ভোজনরসিক মানুষদের কাছে। হাজী বিরিয়ানির দুইটি শাখা রয়েছে। প্রধান শাখা পুরান ঢাকায় নাজিরা বাজারে এবং আরেকটি মতিঝিলে। দোকানটির বয়স এখন ৮৪ বছর। ১৯৮৭ সালের ৮ জুলাই, নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ পুরান ঢাকার ঐতিহ্যবাহী 'হাজী বিরিয়ানি'র ওপর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়েছিল, দিনে ১ হাজার ৯০০ থেকে ২ হাজার মানুষ হাজী বিরিয়ানির নিয়মিত গ্রাহক।

## জয়কালী মিষ্টান্ন ভান্ডার - ১৯৩৯ সাল

টাঙ্গাইলের মিষ্টি শিল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই পোড়াবাড়ির চমচমের কথা বলতে হয়। পোড়াবাড়ির চমচমের জন্য এখন বিখ্যাত টাঙ্গাইল শহরের পাঁচআনী বাজার। সেখানে প্রায় অর্ধশতাধিক মিষ্টির দোকান রয়েছে। টাঙ্গাইল জেলায় হাজার খানেক মিষ্টির দোকান রয়েছে। তবে টাঙ্গাইলের পাঁচআনী বাজারে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ জয়কালী মিষ্টান্ন ভান্ডারের মিষ্টি। প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৯ সাল থেকে মিষ্টি তৈরি করে বিক্রি করে আসছে। তাদের কারখানায় ৩০ থেকে ৪০ জন কারিগর রয়েছেন। চর এলাকা থেকে দুধ আসে তাদের কারখানায়। গড়ে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০ মণ মিষ্টি তৈরি করে তারা। ৮৪ বছরের পুরনো এই দোকানটির মালিক স্বপন ঘোষ।

## ক্যাফে কর্নার - ১৯৬২ সাল

পুরান ঢাকা যেন মুখরোচক খাবারের রাজধানী। এখানে এমন অনেক খাবারের দোকান আছে যেগুলোর বয়স ৫০-এর চেয়েও বেশি। এরকমই একটি দোকান 'ক্যাফে কর্নার' যা ১৯৬২ সালে যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশের বরেণ্য কবি শামসুর রাহমান, জসীম উদদীন প্রায়ই বিকেলে নাস্তা করতেন এই ক্যাফে কর্নারে। ৬০ বছর ধরে পুরান ঢাকার মানুষের

কাছে জনপ্রিয় এক রেস্তোরাঁ 'নিউ ক্যাফে কর্নার'। দীর্ঘদিনের সেই চিরচেনা সেই স্বাদ ধরে রেখেছে রেস্তোরাঁটি। সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবার 'ক্রেম চাপ' যা রেস্তোরাঁর শুরু থেকেই রয়েছে তালিকায়। খাসির মাংসের কাটলেটের মতো খাবারটি পরিবেশন করা হয় গরম-গরম পাউরুটির সঙ্গে। সকালের নাশতায় পরোটা ও ডালভাজির সঙ্গে মিলবে ডিম আর খাসির ভুনা। দুপুর ও রাতের খাবার তালিকায় রয়েছে মোরগ পোলাও। বিকালের নাশতা আইটেমে থাকে আলুর চপ, মোগলাই পরোটা, কাটলেট, চিংড়ি ফ্রাই, চিকেন ফ্রাই ও ফিশ ফ্রাই। দীর্ঘ ছয় দশক যাবত এই সবগুলো আইটেমগুলো চলছে। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত রেস্তোরাঁটি খোলা থাকে।

## স্টার কাবাব অ্যান্ড রেস্তোরাঁ - ১৯৬৫ সাল

পুরান ঢাকার ছোট্ট একটি গলিতে যাত্রা শুরু হয় স্টার কাবাবের। আজকের দিনে হোটেলটির নাম-যশ-খ্যাতি দেশজুড়ে। পুরো ঢাকা জুড়ে এটি বিস্তৃত-সমাদৃত। সততা আর নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনার ফলে মন কেড়েছে ভোজনরসিকদের। শুরু থেকে খাবারের মান ধরে রেখেছে রেস্তোরাঁটি। এখনো সাধারণের কাছে স্টার কাবাবের অবস্থান শীর্ষে। আজ থেকে প্রায় ৫৮ বছর আগে ১ হাজার বর্গফুট জায়গায় মীর মমতাজ উদ্দিন চালু করেছিলেন স্টার কাবাব। পুরান ঢাকার ঠাঁটারীবাজারের বিসিসি রোডে ১৯৬৫ সালে যাত্রা শুরু হয় দোকানটির। সকালের নাস্তা থেকে দুপুরের কিংবা রাতের খাবার সবকিছুর সন্ধান মিলবে এই রেস্তোরাঁয়। সকালের নাস্তায় খাসির পায়া, মুরগির ঝাল ফ্রাই, চা বেশ জনপ্রিয়। দুপুরে খাবারে খাসির লেগ রোস্ট, চিংড়ি মালাইকারি, কাচ্চি বেশ জনপ্রিয়। স্টারের ফালুদার ভীষণ সুনাম রয়েছে। বলতেই হয় এই রেস্তোরাঁ সকল খাবারের স্বাদ অসাধারণ। দশটির অধিক শাখা রয়েছে এই রেস্তোরাঁর পুরো ঢাকা শহরে।

## জামান হোটেল - ১৯৭৬ সাল

চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হোটেল জামান এন্ড বিরিয়ানী হাউস। চট্টগ্রামবাসীর কাছে 'জামান হোটেল' ডাল-সবজির জন্য বিখ্যাত। চট্টগ্রামে ঘুরতে গেলে বাংলা খাবারের স্বাদ নিতে গেলে অনেকেই হানা দেন এই হোটেলে। ১৯৭৬ সালে চট্টগ্রাম নগরীর আলকরণ মোড়ে যাত্রা শুরু হয় জামান হোটেলের। মোহাম্মদ জামান, মালেকুজ্জামান, নুরুজ্জামান নামে ৩ ভাইয়ের হাত ধরে এই দোকানটির যাত্রা শুরু হয়। শুরুতে চা-পরোটার জন্য চট্টগ্রামজুড়ে এই হোটেলের ব্যাপক কদর ছিল। পরবর্তীকালে দেশি খাবারের জন্য আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এটি। জামান হোটেলের মিক্সড সবজি ও মসুর ডালের রয়েছে ব্যাপক কদর। হোটেলটির তিন উদ্যোক্তার কেউই এখন আর বেঁচে নেই। তাদের সন্তানরা জামান হোটেলের ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। এখনো রুচিসম্মত দেশি খাবারের প্রসঙ্গ উঠলেই জামান হোটেলের নাম আসে সবার আগে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও ঢাকায় এই হোটেলের ২০টির অধিক শাখা রয়েছে। পাঁচ দশক যাবত গুণগত মান ঠিক রেখে ব্যবসা করে যাচ্ছে জামান পরিবারের সদস্যরা।

নাসু ফারুকের সেরা বাকরখানি

## নাসু ফারুকের সেরা বাকরখানি - ১৯৭৭ সাল

পুরান ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে অবস্থিত 'নাসু ফারুকের সেরা বাকরখানি'তে মিলবে সাত রকমের বাকরখানি। অনেকের মতে, এটিই বাকরখানির জন্য এই মুহূর্তে পুরান ঢাকার সর্বোৎকৃষ্ট দোকান। পনির, ঘি, খাস্তা, মিষ্টি, নোনতা ঘি, মিষ্টি ঘি আর ঝাল বাকরখানি; এই সাত রকম স্বাদের বাকরখানি মিলবে ৪৬ বছরের পুরনো এই দোকানে। তাদের ঘিয়ে তৈরি নোনতা বাকরখানি কিছুটা শুকনা থাকে তবে খুব মচমচে হয়; চা আর দুধ দিয়ে খেতে ভীষণ ভালো। ঘিয়ের মিষ্টি বাকরখানিতে দেওয়া হয় তিল আর এলাচের নির্যাস। ঝাল বাকরখানিতে মাংস বা কিমা ব্যবহার করা হয়। পুরান ঢাকাবাসীর কাছে বাকরখানি অনেকটা ডাল-ভাতের মতো, প্রতিদিনের আহার। তবে বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের কাছে বাকরখানির আলাদা গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। মিষ্টি বাকরখানির চাহিদা সবচেয়ে বেশি এই দোকানের।